মাটিবিহীন চাষবাস

একবার ভাবুন তো! গাছ আছে, ফল আছে, ফুল আছে আপনার প্রিয় আঙিনায়; কিন্তু গাছের নিচে মাটি নেই। ভাবছেন, ধ্যাৎ এটা আবার হয় নাকি! মাটি ছাড়া তো গাছ থাকবেই না। হ্যাঁ, এবার থেকে আপনার প্রিয় আঙিনায় মাটি ছাড়াই জন্মাবে প্রিয় ফসল, ফুল ও সবজি। মাটির পরিবর্তে পানিতেই অবলীলায় জন্মাতে পারবেন টমেটো, লেটুস, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, ক্ষীরা, ক্যাপসিকাম, স্ট্রবেরি, অ্যানথরিয়াম, গাঁদা, গোলাপ, অর্কিড, চন্দ্রমল্লিকা আরো কত ফসল। মাটিবিহীন পানিতে ফসল উৎপাদনের এ কৌশলকে বলে হাইড্রোপনিক, যা একটি অত্যাধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সারাবছরই সবজি ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এখন থেকে যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি কম কিংবা নেই সেখানে বাড়ির ছাদে, আঙ্গিনায়, বারান্দা, খোলা জায়গায় পলি টানেল, টব, বালতি, জগ, বোতল, পাতিল, প্লাস্টিকের ট্রে, নেট হাউসে হাইড্রোপনিক, পদ্ধতিতে অনায়াসে সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন করতে পারবে বাংলাদেশের কৃষক থেকে শুরু করে শৌখিন সম্প্রদায়। এই চাষাবাদে কোনো কীটনাশক বা আগাছানাশক কিংবা অতিরিক্ত সার দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই অনায়াসে গড়ে তুলতে পারবেন অরগানিক ফসলের সম্ভার। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) বিজ্ঞানীরা এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ কে এম সেলিক রেজা মল্লিক ১৯৯৭ সালে জাপানে হাইড্রোপনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এ প্রযুক্তি প্রথম বাংলাদেশে নিয়ে আসেন ২০০৬ সালে। ২০০৭ সালে তিনি বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইড্রোপনিক প্রযুক্তির গবেষণা শুরু করেন টমেটো, ক্যাপসিকাম, লেটুস ও স্ট্রবেরি এই চারটি ফসল নিয়ে। এ গবেষণায় সাফল্যের পর ২০০৮ সালে এর সঙ্গে ক্ষীরা, শসা, গাঁদা ফুল ও বেগুন এবং ২০০৯ সালে বামন শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, চন্দ্রমল্লিকা যোগ করেন। বিজ্ঞানী মল্লিক এ গবেষণায় ব্যাপকভাবে সাফল্য পান। বিজ্ঞানী এ কে এম সেলিক রেজা মল্লিক জানান, লাভজনক ফসলের ক্ষেত্রে এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। জনবহুল দেশে যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি কম কিংবা নেই সেখানে ঘরের ছাদে বা আঙ্গিনায়, পলি টানেল, নেট হাউসে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন সম্ভব। উন্নত বিশ্বের যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, তাইওয়ান, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাণিজ্যিকভাবে এর মাধ্যমে সবজি ও ফল উৎপাদন করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে সারাবছরই সবজি ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব এবং উৎপাদিত সবজি ও ফলে কোনো কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না বিধায় এ সবজি ও ফল নিরাপদ এবং অধিক বাজারমূল্য পাওয়া যায়।

সাধারণত দুই উপায়ে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়

১. সঞ্চালন পদ্ধতি এবং

২. সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতি

সঞ্চালন পদ্ধতিতে গাছের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানগুলো যথাযথ মাত্রায় মিশ্রিত করে একটি ট্যাংকিতে নেয়া হয় এবং পাম্পের সাহায্যে পাইপের মাধ্যমে ট্রেতে পুষ্টি দ্রবণ সঞ্চালন করে ফসল উৎপাদন করা হয়। প্রতিদিন অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পাম্পের সাহায্যে এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া চালু রাখা দরকার। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে প্রথম বছর ট্রে, পাম্প এবং পাইপের আনুষঙ্গিক খরচ একটু বেশি হলেও পরবর্তী বছর থেকে শুধু রাসায়নিক খাদ্য উপাদানের খরচ প্রয়োজন হয়। ফলে দ্বিতীয় বছর থেকে খরচ অনেকাংশে কমে যাবে। এ পদ্ধতিতে গ্যালভানাইজিং লোহার ট্রের ওপর কর্কশিটের মধ্যে গাছের প্রয়োজনীয় দূরত্ব অনুসারে যেমন- লেটুস ২০×২০ সেন্টিমিটার টমেটো ৫০×৪০ সেন্টিমিটার এবং স্ট্রবেরি ৩০×৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে গর্ত করতে হয়। উপযুক্ত বয়সের চারা স্পঞ্জসহ ওই গর্তে স্থাপন করতে হয়।

অপরদিকে, সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতিতে একটি ট্রেতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলো পরিমিত মাত্রায় সরবরাহ করে সরাসরি ফসল চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্য উপাদান সরবাহের জন্য কোনো পাম্প বা পানি সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে খাদ্য উপাদান মিশ্রিত দ্রবণ ও এর ওপর স্থাপিত কর্কশিটের মধ্যে ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে এবং কর্কশিটের ওপরে ৪-৫টি ছোট ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে এবং গাছ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কর্কশিটের ফাঁকা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারে। ফসলের প্রকারভেদে সাধারণত ২-৩ বার এই খাদ্য উপাদান ট্রেতে যোগ করতে হয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সহজেই এ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্লাস্টিক বালতি, পানির বোতল, মাটির পাতিল ইত্যাদি ব্যবহার করে বাড়ির ছাদ, বারান্দা এবং খোলা জায়গায় সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন করতে পারে। এতে খরচ তুলনামূলক অনেক কম হবে।

যেসব ফসল হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যাবে তা হলো- পাতা জাতীয় সবজির মধ্যে লেটুস, গিমাকলমি, বিলাতি ধনিয়া, বাঁধাকপি। ফল জাতীয় সবজির মধ্যে টমেটো, বেগুন, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, শসা, ক্ষীরা, মেলন, স্কোয়াস, ফল স্ট্রবেরি, ফুল অ্যানথরিয়াম, গাঁদা, গোলাপ, অর্কিড, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতির চারা উৎপাদন প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মলিক বলেন, হাইড্রোপনিকস পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্পঞ্জ ব্লক ব্যবহার করা হয়। সাধারণত স্পঞ্জকে ৩০ সেন্টিমিটার × ৩০ সেন্টিমিটার সাইজে কেটে নিতে হয়। এই স্পঞ্জকে ২.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং ২.৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ বর্গাকারে, ডট ডট করে কেটে নিতে হয় এবং এর মাঝে ১ সেন্টিমিটার করে কেটে প্রতিটি বর্গাকারে স্পঞ্জের মধ্যে একটি করে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের আগে বীজকে ১০ শতাংশ ক্যালসিয়াম অথবা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ বপনের পর

স্পঞ্জকে একটি ছোট ট্রেতে রাখতে হবে। এই ট্রের মধ্যে ৫-৮ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে যাতে স্পঞ্জটি পানিতে সহজে ভাসতে পারে। চারা গজানোর ২-৩ দিন পর প্রাথমিক অবস্থায় ৫-১০ মিলিলিটার খাদ্যোপাদানে সংবলিত দ্রবণ একবার এবং চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর থেকে চারা রোপণের আগ পর্যন্ত প্রতিদিন ১০-২০ মিলিলিটার দ্রবণ দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে চারা রোপণের পর দ্রবণের পিএইচ (অম্ল) মাত্রা ৫.৮ থেকে ৬.৫-এর মধ্যে এবং ইসি (ক্ষার) মাত্রা ১.৫ থেকে ১.৯-এর মধ্যে রাখা দরকার। গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ে ওপর থেকে সুতা বা শক্ত রশি ঝুলিয়ে গাছ সোজা ও খাড়া রাখতে হয় এবং পরিচর্যা সাধারণ গাছের মতোই করতে হবে।
হাইড্রোপনিক পদ্ধতির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ ও তৈরির প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন রকম। প্রতি ১ হাজার লিটার পানির জন্য পটাশিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ২৭০ গ্রাম, পটাসিয়াম নাইট্রেট ৫৮০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ১ হাজার গ্রাম, ম্যাগানেসিয়াম সালফেট ৫১০ গ্রাম, ইডিটিএ আয়রন ৮০ গ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ৬.১০ গ্রাম, বরিক এসিড ১.৮০ গ্রাম, কপার সালফেট ০.৪০ গ্রাম, অ্যামনিয়াম মলিবটেড ০.৩৮ গ্রাম, জিংক সালফেট ০.৪৪ গ্রাম হারে পানিতে মিশিয়ে খাদ্য দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

জলীয় খাদ্য দ্রবণ তৈরির সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমে স্টোক সলিউসান তৈরি করতে হবে। এই স্টোক তেরি করার সময় ক্যালসিয়াম নাইট্রেট- কে পরিমাপ করে ১০ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করে দ্রবণকে স্টোক সলিউসান 'এ' নামে নামকরণ করতে হবে। অবশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে একসঙ্গে ১০ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করে স্টোক সলিউসান ' বি' নামে নামকরণ করতে হবে। ১ হাজার লিটার জলীয় দ্রবণ তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে ১ হাজার লিটার পানি ট্যাংকে নিতে হবে। তারপর স্টোক সলিউসান 'এ' থেকে ১০ লিটার দ্রবণ ট্যাংকের পানিতে ঢালতে হবে এবং একটি অধাতব দন্ডের সাহায্যে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মেশাতে হবে। এরপর স্টোক সলিউসান ' বি' থেকে আগের মতো ১০ লিটার দ্রবণ ট্যাংকে নিতে হবে এবং আগের মতো অধাতব দন্ডের সাহয্যে পানিতে স্টোক সলিউসান গুলো সমানভাবে মেশাতে হবে।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতির চাষাবাদের সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো. আব্দুল হক প্রতিবেদককে জানান, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না বিধায় সারাবছর কিংবা অমৌসুমেও সবজি, ফল, ফুল চাষাবাদ করা যায়। পদ্ধতিটি মাটিবিহীন চাষ পদ্ধতি হওয়ায় মাটিবাহিত রোগ ও কৃমিজনিত রোগ হয় না। কীটপতঙ্গের আক্রমণ কম হওয়ার কারণে এই পদ্ধতিতে কীটনাশকমুক্ত সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে ছোট এবং বড় পরিসরে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিচ্ছন্নভাবে ফসল উৎপাদন করা যায়। এটি হোম-ফার্মিংয়ের জন্য একটি আদর্শ প্রযুক্তি বিধায় অধিক লাভজনক, অর্থকরী ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

প্রতিদিন কমছে ২২০ হেক্টর চাষযোগ্য জমি। ফসলের মাঠে শিল্প আর শিল্পের জায়গায় হচ্ছে আবাসন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বসতভিটা তৈরি, অপরিকল্পিত চাষাবাদ, যোগাযোগের জন্য রাস্তা ও শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের কারণে দেশে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সঙ্কুচিত হচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার অব্যাহত খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাই শুধু আবাদি জমির ওপর নির্ভর করা যাবে না। দেশের এমনি অবস্থায় প্রয়োজন অব্যবহৃত খালি জায়গা ও পতিত স্থান শষ্য চাষের আওতায় আনা। হাইড্রোপনিকস চাষ পদ্ধতি এক্ষেত্রে সঠিকভাবে আরোপযোগ্য একটি কৌশল। এ পদ্ধতি বাড়ির ছাদে, আঙ্গিনায়, বারান্দায় কিংবা চাষের অযোগ্য পতিত জমিতে সহজেই চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এতে করে একদিকে যেমন পতিত জমি বা অব্যবহৃত জায়গার সফল ব্যবহার হবে, অন্যদিকে দেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হবে।
লেখক : গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, কৃষিবিদ,
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী
তথ্যসূত্র: দৈনিক ডেসটিনি

ভাসমান চাষাবাদ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকা প্রতি বছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। কয়েক শতাব্দীকাল থেকে এসব এলাকার মানুষ এই আবহাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এসব মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী। আর তাই জীবিকার তাগিদে তাদের পূর্বপুরুষরা মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে উদ্ভাবন করেছেন ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি। মূলত বর্ষাকালে সহজলভ্য কচুরিপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করে সেখানেই চলে প্রচলিত এই চাষাবাদ। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার জন্য চলে এত সব আয়োজন।

স্থানীয়ভাবে এই ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি বায়রা, গেটো বা ধাপ চাষাবাদ নামে সুপরিচিত। গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, নড়াইল, যশোর, বরিশাল, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি জেলা ও উপকূলীয় অন্যান্য এলাকায় বর্ষা মৌসুমে এই ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে লাভজনক ভাসমান চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগের বিলঝিল ও বর্ষাকালে সারা দেশের জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলোতে এটি বিকল্প চাষাবাদের লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে দেশে দুই হাজার ৫০০ হেক্টর জলাভূমিতে ভাসমান চাষাবাদ করা হচ্ছে। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দুই লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাভূমি রয়েছে যার ৫০ হাজার হেক্টর এলাকা সফলভাবে ভাসমান চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দীঘি প্রভৃতি জলাশয় এবং বর্ষাকাল ও বন্যার সময় জলমগ্ন কৃষিজমিতে সফলভাবে ভাসমান চাষাবাদ করা যায়।

বায়রা বা বেড তৈরির পদ্ধতি : ভাসমান চাষাবাদের জন্য প্রধানত কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়। তবে হোগলা, সোলা, নলখাগড়া, বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা, ধানের খড়, নাড়া, তুষ প্রভৃতিও ব্যবহার করা যায়। জমি থেকে ধান কাটার পর গাছের যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থেকে যায় তাকে নাড়া বলে। এসব নাড়া সংগ্রহ করে রাখা হয় বর্ষাকালে বেড তৈরির জন্য। মে-জুন মাসে নিকটবর্তী নদী বা খাল থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে কচুরিপানা দিয়ে একটি লেয়ার তৈরি করে ৭-১০ দিন রেখে দেয়া হয়। এরপর আবার নাড়া বা কচুরিপানা দিয়ে আরেকটি লেয়ার তৈরি করা হয়। এর ওপর অনেক সময় কাদামাটি ও গোবরের একটি আস্তর দেয়া হয়। পুরো বেড তৈরি করে ফসল লাগাতে ১৮-২০ দিন সময় লাগে। এসব বেডের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার নেই, তবে ছোট আকারের বেডের ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং ফলনও তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়। স্থানীয় পর্যায়ে ৮-১৫ মিটার লম্বা, ১.৫-২.০ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৬-১.০ মিটার গভীর বেড ব্যবহার করা হয়। এসব ভাসমান বেড আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি দ্বীপ পদ্ধতি অন্যটি স্থায়ী ভাসমান পদ্ধতি। সাধারণত স্থির পানিতে দ্বীপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাতে বেডটি মুক্তভাবে পানিতে ভাসতে থাকে। আর প্রবহমান পানিতে স্থায়ী ভাসমান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাতে বেডটিকে খুঁটির সাহায্যে বেঁধে রাখা হয়।

ভাসমান চাষাবাদের সুবিধা : পতিত জলাবদ্ধ জমির চাষের আওতায় এনে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়। প্রচলিত চাষের জমি থেকে ভাসমান বেডগুলো অনেক বেশি উর্বর তাই ফলনও হয় বেশি। এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকার সার বা সেচের প্রয়োজন হয় না। চাষ শেষে বেডটি জৈবসার হিসেবে রবি মৌসুমে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। বর্ষা মৌসুমে বা জলাবদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়। অরক্ষিত প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। বন্যার সময় ধান ও সবজির বীজতলা তৈরি করে মৌসুমি উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। এ ছাড়া বন্যার সময় এসব বেড হাঁস-মুরগির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার হয়। এ পদ্ধতিতে জেলেরা একই সাথে ফসল ও মৎস্যচাষ করতে পারে। এটি একটি পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি, যাতে অর্গানিক ফসল চাষ করা যায়। নিম্নাঞ্চলের মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার সংস্থান করে। ক্ষতিকর জলজ আগাছা কচুরিপানার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে এটি একটি লাগসই প্রযুক্তি।

চাষোপযোগী ফসল : এসব ভাসমান বেডে মূলত শাকসবজি চাষ করা হয়। প্রায় ২৩ ধরনের শাকসবজি ও মসলা চাষ করা যায়। বর্ষাকালে চাষযোগ্য ফসলগুলো হলোঙ্ক ঢেঁড়স, মিষ্টিকুমড়া, শসা, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, করলা, ঝিঙে, লালশাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক, কলমিশাক, কচু, বেগুন প্রভৃতি। আবার শীতকালে শিম, বরবটি, লাউ, আলু, টমেটো, মুলা, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ প্রভৃতি চাষ করা যায়। কিছু কিছু ফসল সারা বছর ধরেও চাষ করা যায়। মৌসুমি বন্যায় বর্ষাকালীন ফসল চাষের পর শীতকালীন ফসল লাগিয়ে দেয়া হয়। বর্ষা শেষে পানি শুকিয়ে গেলে বেডটি মাটিতে স্থায়ী হয় এবং বিনা চাষে রবি ফসল ফলানো যায়। অথবা বেডটি ভেঙে জমিতে মিশিয়ে দেয়া হয় ফলে কোনো প্রকার রাসায়নিক সার ছাড়াই রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়া আগাম মৌসুমি বন্যায় ভাসমান বেডে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করা যায় এবং বন্যার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে চারা লাগিয়ে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। ভাসমান বেডে মূলত বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করা হলেও প্রতিকূল পরিবেশে ধানের বীজতলা ও নার্সারি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

বেড ব্যবস্থাপনা : একটি ভাসমান বেডে এক বছর ফসল চাষ করা যায়। বেডে সরাসরি বীজ লাগানো যায়, তবে অনেক সময় আরেকটি ভাসমান পিটে (যা স্থানীয়ভাবে টৈমা নামে পরিচিত) চারা তৈরি করে পরে পিটটি বেডে স্থানান্তর করা হয়। ভাসমান চাষ পদ্ধতিতে কৃষককে কোনো প্রকার সার বা সেচ প্রদান করতে হয় না। তবে অনেক সময় পোকামাকড় ও ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। এ ছাড়া বেডে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে লাগানো বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এসব বেডে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকায় বেশ ঘন করে ফসল লাগানো হয়। গভীর পানিতে বেড তৈরি করলে বেডের আন্ত:পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহের জন্য নৌকার প্রয়োজন হয়। ভাসমান বেডে শাকসবজি চাষ বেশ লাভজনক। বর্ষাকালে এমনিতেই শাকসবজির দাম বেশি থাকে। আবার ভাসমান বেডে তৈরি হওয়া জৈব সারের কারণে জমিতে প্রচলিত চাষের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। এ ছাড়া এসব বেডে রবি মৌসুমের জন্য আগাম বীজতলা তৈরি করা যায় ও আগাম ফসল তুলে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

শেষ কথা : বাংলাদেশে ভাসমান চাষাবাদের ইতিহাস ৩০০ থেকে ৪০০ বছরের পুরনো। আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষরা জীবিকার প্রয়োজনে তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে চাষের এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। অথচ এজাতীয় হাইড্রোপনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ভবিষ্যতের চাষাবাদ পদ্ধতি হিসেবে এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। এটা আমাদের সমৃদ্ধ জাতিসত্তার প্রমাণ বহন করে। বিগত কয়েক

দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে আবাদি জমির পরিমাণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে প্রতি বছর এক শতাংশ হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। আবার অন্য দিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ঘন ঘন সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, দীর্ঘমেয়াদি বর্ষাকাল, উপকূলীয় এলাকার জলাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার জন্য এক মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশের সাথে চাষাবাদ পদ্ধতিকে অভিজোযিত করা একান্ত প্রয়োজন। ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দীঘি ও উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্য চাষের পাশাপাশি ফসল চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। তাই ফসল চাষের আওতা বৃদ্ধি করা এবং বছরজুড়ে এমনকি প্রতিকূল পরিবেশেও ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি নি:সন্দেহে একটি চমৎকার লাগসই বিকল্প।

লেখক: আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ